# কোষ রসায়ন

## (CELL CHEMISTRY)

**ইউনিট ৪**

### ভূমিকা

কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কার্যকরী একক। জীব তথা উদ্ভিদ ও প্রাণী এককোষী থেকে বহুকোষী হয় এবং এদের গঠনও সরলতর হতে জটিলতর হয়। সকল প্রকার জীবকোষে সার্বক্ষণিক কোন না কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে। এজন্য কোষকে বলা হয় রাসায়নিক কারখানা। জীবকোষে প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রব্য রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ায় অংশ নেয় তাদের অল্প কয়েকটি দ্রব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

শর্করা সমৃদ্ধ উপকরণ

প্রোটিন সমৃদ্ধ উপকরণ

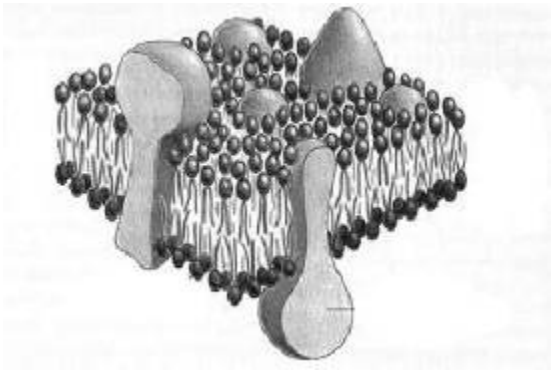

লিপিড সমৃদ্ধ উপকরণ

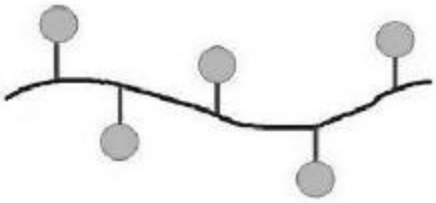

এনজাইম

| ইউনিট সমাপ্তির সময় | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ |
|---|---|
| **এ ইউনিটের পাঠসমূহ** | |
| পাঠ ৪.১ : জীবের রাসায়নিক উপাদান<br>পাঠ ৪.২ : কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিভাগ<br>পাঠ ৪.৩ : জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা | পাঠ ৪.৪ : এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি<br>পাঠ ৪.৫ : এনজাইমের শ্রেণিবিভাগ<br>পাঠ ৪.৬ : বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার |

# পাঠ-৪.১ জীবের রাসায়নিক উপাদান

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- জীবের রাসায়নিক উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **প্রধান শব্দ** | জৈব রসায়ন, উদ্ভিদ জৈব রসায়ন |

কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। আর প্রতিটি জীবদেহ কতকগুলো রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এসব রাসায়নিক উপাদানগুলো কোষ নির্ভর। গত ৫০ বছরের আবিষ্কার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের আলোকে বলা যায় কোষ একটি জটিল গঠন। আমরা জানি, জীবনের উন্মেষ থেকে শুরুকরে জৈবনিক কার্যকলাপ সর্বত্রই রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ছড়াছড়ি। তাই কোষকে বলা হয় একটি রাসায়নিক কারখানা।

কোষে জীবন ধারণের সব উপকরণ তৈরি হয়ে বিরাজ করে। উদ্ভিদদেহও বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এদের জীবন গঠন ও জীবন ধারণের জন্যে এ ধরনের বহু পদার্থের দরকার হয়। এদের অনেকগুলোই দেহের অভ্যন্তরে তথা কোষাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে জৈব রসায়ন বলা হয়। আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে উদ্ভিদ জৈব রসায়ন বলা হয়। সজীব উদ্ভিদদেহ বিশ্লেষণ করলে প্রধান যে উপাদান পাওয়া যায় তা হলো পানি। দেহের প্রায় শতকরা ৬০-৯০ শতাংশ হলো পানি। বাকি যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে কঠিন বস্তু বলা হয়। ১৬টি মৌলিক পদার্থ যেমন- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, সালফার, কপার ও জিঙ্ক মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান। জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, অন্যান্য জৈব অ্যাসিড, বিভিন্ন এনজাইম ইত্যাদি প্রধান। অজৈব উপাদানের মধ্যে পানি অন্যতম পদার্থ।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে জৈব ও অজৈব উপাদানের নামগুলো লিখুন |
|---|---|
| জৈব উপাদানের নাম | |
| অজৈব উপাদানের নাম | |

**সারসংক্ষেপ**

বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে জৈব রসায়ন বলা হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে উদ্ভিদ জৈব রসায়ন বলা হয়। ১৬টি মৌলিক পদার্থ যেমন- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, সালফার, কপার ও জিঙ্ক মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উদ্ভিদদেহের শতকরা কত ভাগ পানি ?

(ক) ৬০-৭০ (খ) ৬০-৮০ (গ) ৬০-৯০ (ঘ) ৫০-৯০

২। জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলো হলো-

i. প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ii. লিপিড, বিভিন্ন এনজাইম iii. কার্বন, হাইড্রোজেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

# পাঠ-৪.২ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিভাগ

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- কার্বোহাইড্রেট এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রোটিন এর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **প্রধান শব্দ** | মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড, পলিস্যাকারাইড |

**কার্বোহাইড্রেট :** উদ্ভিদের সবুজ অংশে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় কার্বোহাইড্রেট। জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক ও সঞ্চয়ী উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। আমাদের খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদানও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রেট্স অব কার্বন থেকে নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো কার্বনের জলায়ন। কার্বোহাইড্রেটের প্রতি অণু কার্বনের সাথে দু'অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেন থাকে। কাজেই কার্বোহাইড্রেট হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেখানে এদের অনুপাত ১ঃ২ঃ১। কার্বোহাইড্রেট এর সাধারণ ফর্মূলা হলো $(CH_2O)_n$ যেখানে n হলো ৩ বা ৩ এর বেশি সংখ্যা। মনোস্যাকারাইডের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি। তবে একাধিক মনোস্যাকারাইড সহযোগে যে সব কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয় ঐ সব ক্ষেত্রে এ সাধারণ ফর্মূলা প্রযোজ্য নয়। যখন এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে একত্রিত হয়ে এক অণু সুক্রোজ গঠন করে তখন এ সাধারণ ফর্মূলা কার্যকরী হয় না, কারণ বন্ধণী সৃষ্টিকালে এক অণু পানি $(H_2O)$ বের হয় তাই সুক্রোজ এর ফর্মূলা দাঁড়ায় $C_{12}H_{22}O_{11}$।

বর্তমানে নাইট্রোজেন বা সালফার আছে এমন কিছু পদার্থকেও কার্বোহাইড্রেট বলা হয়। আবার কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ১ঃ২ঃ১ নয় এমন কিছু পদার্থকেও কার্বোহাইড্রেট বলা হয়। তাই পলিহাইড্রোক্সিয়্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রোক্সিকিটোন এবং এ সব পদার্থ থেকে উদ্ভুত বস্তুকে বলা হয় কার্বোহাইড্রেট।

**কার্বোহাইড্রেটের শ্রেনিবিন্যাস :** দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। যথা- (ক) কার্বোহাইড্রেটের স্বাদ এবং (খ) কার্বোহাইড্রেটের আণবিক গঠন, আণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম।

**(ক) কার্বোহাইড্রেটের স্বাদ :** স্বাদের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- স্যুগার- এরা স্বাদে মিষ্ট, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি। **নন স্যুগার-** এরা স্বাদে মিষ্ট নয়, অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয়। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

**(খ) কার্বোহাইড্রেটেটের আণবিক গঠন, আণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম :** আণবিক গঠন, আণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। মনোস্যাকারাইড, ২। ডাইস্যাকারাইড, ৩। অলিগোস্যাকারাইড এবং ৪। পলিস্যাকারাইড।

**১। মনোস্যাকারাইড-** যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে অন্য কোন সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না তাদেরকে মনোস্যাকারাইড বলা হয়। মনোস্যাকারাইড অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক একক হিসেবে কাজ করে। এর সাধারণ সংকেত হচ্ছে $(CH_2O)_n$ বা $C_nH_{2n}O_n$। মনোস্যাকারাইডসমূহে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) বা কিটো গ্রুপ (-CO) এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (-OH) থাকে। মনোস্যাকারাইডগুলোতে অ্যালডিহাইড বা কিটো গ্রুপ মুক্তভাবে থাকায় এরা বিজারক বা রিডিউসিং পদার্থ হিসেবে কাজ করে। কাজেই অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) বা কিটো গ্রুপ (-CO) যুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে রিডিউসিং স্যুগার বলা হয়। বেনেডিক্ট দ্রবণ কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড $Cu(OH)_2$ উক্ত স্যুগারের -CHO বা –CO গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্রাস অক্সাইড $(Cu_2O)$ এ পরিণত হয় যা অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়। এর বর্ণ লাল। রিডিউসিং স্যুগার পরীক্ষা বা শনাক্ত করতে এ লাল বর্ণের অধঃক্ষেপকে ব্যবহার করা হয়। মনোস্যাকারাইডসমূহ সাধারণত মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট। মনোস্যাকারাইডে কার্বনের সংখ্যা ৩-১০টি। কার্বনের সংখ্যা অনুযায়ী মনোস্যাকারাইডগুলোকে নামকরণ করা হয়। যেমন- তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ট্রায়োজ, চার কার্বনবিশিষ্ট

মনোস্যাকারাইডকে টেট্রোজ, পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে পেন্টোজ, ছয় কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেক্সোজ, সাত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেপ্টোজ, আট কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে অক্টোজ, নয় কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ন্যানোজ এবং দশ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ডেকোজ বলা হয়।

**ট্রায়োজ-** তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় ট্রায়োজ। যথা- গ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইডোক্সি অ্যাসিটোন।

উদ্ভিদে এরা ফসফেট এস্টার হিসেবে কাজ করে। গ্লিসার‍্যালডিহাইড এর ১নং কার্বনে একটি কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে অ্যালডিহাইড গ্রুপ নির্দেশ করছে এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোনের ২নং কার্বনে কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে কিটো গ্রুপ নির্দেশ করছে। কাজেই গ্লিসার‍্যালডিহাইড একটি অ্যালডোজ এবং ডাইহাইডোক্সি অ্যাসিটোন হলো একটি কিটোজ। অ্যালডিহাইড এবং কিটো গ্রুপকে বলা হয় রিডিউসিং গ্রুপ কারণ এরা সহজেই কতিপয় যৌগের সাথে জারিত হয় এবং ঐ যৌগ বিজারিত হয়। তাই অ্যালডিহাইড ও কিটো গ্রুপ যুক্ত চিনিকে রিডিউসিং স্যুগার বলা হয়।

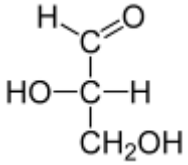

**চিত্র ৪.২.১ : গ্লিসার‍্যালডিহাইড**

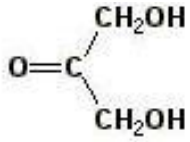

**চিত্র ৪.২.২ : ডাইহাইডোক্সি অ্যাসিটোন**

**টেট্রোজ-** চার কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় টেট্রোজ। যথা- ইরিথ্রোজ। অধিকাংশ উদ্ভিদে এটি ইরিথ্রোজ-৪ ফসফেট হিসেবে অবস্থান করে। ক্যালভিন চক্রে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

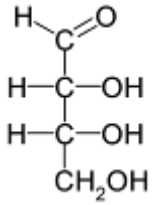

চিত্র ৪.২.৩ : D- ইরিথ্রোজ

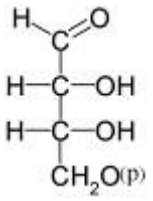

চিত্র ৪.২.৪ : ইরিথ্রোজ- ৪ ফসফেট

**পেন্টোজ-** পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় পেন্টোজ। যথা- জাইলোজ, অ্যারাবিনোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ ইত্যাদি।

রাইবোজ- এটি পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট একটি সুগার যা জীবের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (RNA) একটি গাঠনিক একক। এর আণবিক সংকেত হলো $C_5H_{10}O_5$। কেবলমাত্র রাইবোজই নিউক্লিয়োটাইড এবং নিউক্লিয়োসাইড তৈরিতে অংশ নেয়। এটি নির্দিষ্ট পিউরিন ও পাইরিমিডিন বেস এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিয়োসাইড উৎপন্ন করে। নিউক্লিয়োসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়োটাইডে পরিণত হয়। কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা তৈরিতে রাইবোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার ATP, $NAD^+$, $NADP^+$, FAD, Co-A ইত্যাদি জৈব অণুর সাথেও রাইবোজ যুক্ত থাকে।

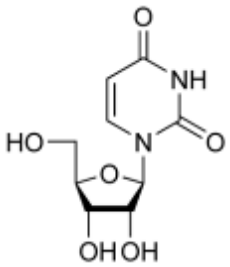

**চিত্র ৪.২.৫ :** নিউক্লিয়োসাইড

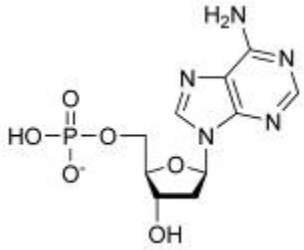

**চিত্র ৪.২.৬ :** নিউক্লিয়োটাইড

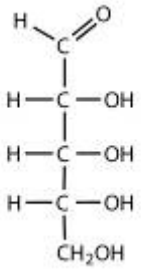

চিত্র ৪.২.৭ : D- রাইবোজ

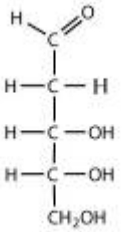

চিত্র ৪.২.৮ : 2-D- ডিঅক্সিরাইবোজ

**ডিঅক্সিরাইবোজ-** এটিও পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট একটি স্যুগার যা জীবের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এর আণবিক সংকেত- $C_5H_{10}O_4$। এর গঠন প্রায় রাইবোজ এর ন্যায় পার্থক্য শুধু এর ২নং কার্বনে -OH গ্রুপের পরিবর্তে কেবল একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। ডিঅক্সি অর্থ অক্সিজেন ছাড়া অর্থাৎ ২নং কার্বনে কোন অক্সিজেন থাকে না। এর ১নং কার্বন অবস্থানে যে কোনো একটি পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস (A, T, G, C) যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিয়োসাইড সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৫নং কার্বন অবস্থানে অজৈব ফসফেট যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড সৃষ্টি হয়। DNA নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিয়োটাইড গঠনের অংশ হিসেবে বিরাজ করে ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগার। এ স্যুগার ছাড়া DNA গঠন সম্ভব নয়।

**হেক্সোজ-** ছয় কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় হেক্সোজ। যথা- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ ইত্যাদি। এরা উদ্ভিদ কোষে মুক্ত অবস্থায় অথবা অন্য জটিল কার্বোহাইড্রেটের সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণত গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

### গ্লুকোজ

গ্লুকোজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদ কোষে দ্রবণীয় অবস্থায় এটি অবস্থান করে। এর আণবিক সংকেত- $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি রিডিউসিং স্যুগার। এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকায় একে অ্যালডোহেক্সোজ বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার পাকা ফল ও মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ পাওয়া যায়। একে অনেক সময় গ্রেইপ স্যুগার বা আঙ্গুরের শর্করা বলা হয়। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ তৈরি করলেও উদ্ভিদে কখনও গ্লুকোজ সঞ্চিত থাকে না। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ গ্লুকোজ।

**গ্লুকোজ তৈরি এবং তৈরি প্রণালি :** প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদ থেকে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয়। আবার গবেষণাগারে হাইড্রোলাইসিস করে সুক্রোজ ও স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি করা হয়।

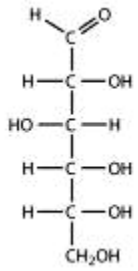

**চিত্র ৪.২.৯ :** গ্লুকোজ

গ্লুকোজের বৈশিষ্ট্য- গ্লুকোজ সাদা দানাদার পদার্থ, এটি স্বাদে মিষ্ট ও পানিতে সহজেই দ্রবণীয় এবং এটি অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয়।

গ্লুকোজের ব্যবহার- রোগীর পথ্য হিসেবে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন ফল সংরক্ষণে একে ব্যবহার করা হয়, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসেবে ওষুধ শিল্পে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়, ভিটামিন সি তৈরির কাজে একে ব্যবহার করা হয় এবং গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

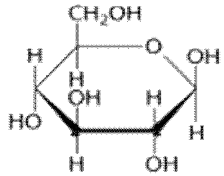

চিত্র ৪.২.১০ : বিটাগ্লুকোজ

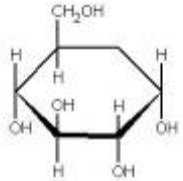

চিত্র ৪.২.১১ : আলফা গ্লুকোজ

**গ্লুকোজের রিং স্ট্রাকচার এবং গ্লুকোজ :** গ্লুকোজের ১নং কার্বন এবং ৫নং কার্বন কাছাকাছি এলে (দ্রবণে সাধারণত কাছাকাছি আসে) এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু তৈরি হয় । এর ফলে ১নং কার্বনে একটি -OH গ্রুপ সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্ট এ -OH গ্রুপ ১নং কার্বনের $\alpha$ এবং $\beta$ অবস্থানে থাকতে পারে। -OH গ্রুপের এ $\alpha$ অবস্থানের কারণে গুকোজের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। যেমন- $\beta$ গ্লুকোজ গঠন করে সেলুলোজ কিন্তু $\alpha$ গ্লুকোজ গঠন করে স্টার্চ। সেলুলোজ কোষের গাঠনিক বস্তু কিন্তু স্টার্চ কোষের সঞ্চয়ী খাদ্য বস্তু।

**D এবং L গ্লুকোজ-** গ্লুকোজের৫নং কার্বন হলো দূরবর্তী অপ্রতিসম কার্বন। এ ৫নং কার্বনে সংযুক্ত -OH মূলক ডান দিকে থাকলে তাকে বলা হয় D-গ্লুকোজ। আবার ৫নং কার্বনে সংযুক্ত -OH মূলক বাম দিকে থাকলে তাকে বলা হয় L গ্লুকোজ। D এবং L শ্রেণীর সমাণুগুলো পরস্পর দর্পণ প্রতিবিম্ব হয়। D-গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত হয় যাকে d বা + চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। L-গ্লুকোজ বামাবর্ত হয় যাকে l চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। দক্ষিণাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক ডান। আর বামাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক হলো বাম। গ্লুকোজেরd বা l ফরম অপটিক্যাল রোটেশন ছাড়া অন্যান্য সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য একই রকমের। উদ্ভিদে সব সময়ই D-গ্লুকোজ থাকে।

**ফ্রুক্টোজ-** গ্লুকোজেরন্যায় ফ্রুক্টোজও ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ যা গ্লুকোজেরন্যায়। এটিও একটি রিডিউসিং স্যুগার। এর গঠনে থাকে একটি কিটো গ্রুপ। তাই একে কিটোহেক্সোজও বলা হয়। অধিকাংশ পাকা মিষ্টি ফল ও মধুতে ফ্রুক্টোজ থাকে। এর আর এক নাম ফ্রুট স্যুগার। গ্লুকোজ থেকে সহজেই ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় আবার সুক্রোজ হাইড্রোলাইসিস এর ফলেও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। এটি সুক্রোজ এর একটি গাঠনিক উপাদান। গ্লুকোজেরন্যায় ফ্রুক্টোজও D এবং L দু'প্রকার হয়।

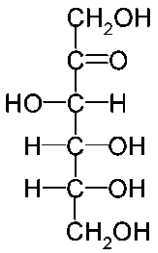


চিত্র ৪.২.১২ : সুক্রোজ

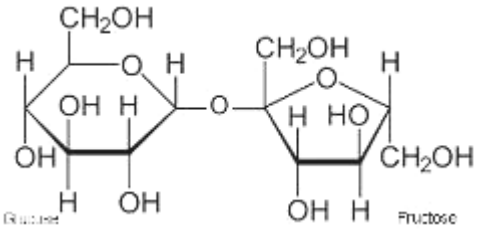


চিত্র ৪.২.১৩ : ফ্রুক্টোজ

ফ্রুক্টোজের বৈশিষ্ট্য- এটি একটি সাদা দানাদার কঠিন পদার্থ, এটি পানিতে সহজেই দ্রবণীয়, আবার গরম অ্যালকোহলেও দ্রবণীয়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং এদেরকে পরস্পরের আইসোমার বলা হয়।

ফ্রুক্টোজের ব্যবহার- নানা ধরনের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতে কনফেকশনারিতে একে ব্যবহার করা হয়।

**ম্যানোজ-** ম্যানোজ একটি ৬ কার্বনবিশিষ্ট হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোজ স্যুগার।

**গ্যালাক্টোজ-** এটিও ৬ কার্বনবিশিষ্ট হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটিও একটি অ্যালডোজ স্যুগার।

**২। ডাইস্যাকারাইড-** মনোস্যাকারাইডের দুটি অণু একত্রে যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইস্যাকারাইড। যথা- সুক্রোজ, সেলোবায়োজ, ম্যালটোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি। ডাইস্যাকারাইডের সাধারণ সংকেত হলো- $C_{12}H_{22}O_{11}$।

**সুক্রোজ-** সুক্রোজ হলো উদ্ভিদের প্রধান ডাইস্যাকারাইড। এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু ফ্রুক্টোজ একসাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুক্রোজ। এতে এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে যায়। চিনি একটি সাধারণ সুক্রোজ। ইক্ষু এবং বীট থেকে চিনি পাওয়া যায়। এটি রিডিউসিং স্যুগার নয়। এর অপর নাম বিজারণ ক্ষমতাহীন চিনি। সুক্রোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইড তথা $\alpha$-ডি গ্লুকোজের১নং কার্বনের -OH এবং $\beta$-ডি গ্লুকোজের২নং কার্বনের -OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়। ফলে কার্বন দুটির মধ্যে একটি O ব্রিজ গঠিত হয়ে সুক্রোজ সৃষ্টি করে। পাতায় তৈরিকৃত কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

**সুক্রোজ প্রস্তুত প্রণালি :** ইক্ষুর রসে প্রায় ১৫% সুক্রোজ, কিছু পরিমাণ জৈব অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফসফেট জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সংগৃহীত রসকে পরিস্রুত করার পর তার সাথে কলিচুন মিশানো হয়। এর ফলে অ্যাসিড প্রশমিত হয়, ফসফেট অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়। অতঃপর রসকে উত্তপ্ত করলে বেশির ভাগ ভেজাল ফেনাও অধঃক্ষেপ আকারে বের হয়। পরিস্রবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিস্কার রসকে নিম্নচাপে ঘনীভূত করলে সুক্রোজ এর স্ফটিক পাওয়া যায়।

সুক্রোজের বৈশিষ্ট্য: সুক্রোজ সাদা দানাদার কঠিন পদার্থ, স্বাদে গ্লুকোজ থেকে সুক্রোজ দ্বিগুণ মিষ্টি, পানিতে এরা দ্রবণীয়, এটি বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও ইথারে অদ্রবণীয়, এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সেলসিয়াস এবং একে হাইড্রোলাইসিস (আর্দ্রবিশ্লেষণ) করলে সম পরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।

সুক্রোজের কাজ- শ্বসনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফলে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষের বিভিন্ন উপাদান বিশেষ করে পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে একে ব্যবহার করা হয়।

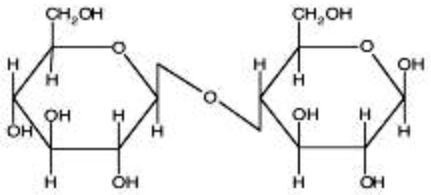

চিত্র ৪.২.১৪ : সেলোবায়োজ

**সেলোবায়োজ-** দুটি গ্লুকোজ অণু তাদের β-১-৪ লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে একটি সেলোবায়োজ তৈরি করে। কাজেই সেলোবায়োজ একটি ডাইস্যাকারাইড। সাধারণত সেলুলোজ বা লিগনিন এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে সেলোবায়োজ তৈরি হয়। দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ গঠন করে। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সেলোবায়োজ একটি বিজারণক্ষম চিনি অর্থাৎ রিডিউসিং স্যুগার।

সেলোবায়োজের কাজ- কোষ প্রাচীরে এটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

**ম্যালটোজ-** ম্যালটোজ আর একটি ডাইস্যাকারাইড। এটিও দুটি গ্লুকোজ অণু তাদের α-১-৪ লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে একটি ম্যালটোজ অণু তৈরি করে। সাধারণত স্টার্চ এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে ম্যালটোজ তৈরি হয়। এটি আংশিক রিডিউসিং স্যুগার।

**(গ) অলিগোস্যাকারাইড :** যে সব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদেরকে অলিগোস্যাকারাইড বলা হয়। তিনের অধিক মনোস্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সংযুক্তিকে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ বলা হয়। অলিগোস্যাকারাইডগুলোকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা দিয়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন- তিনটি মনোস্যাকারাইড থাকলে ট্রাইস্যাকারাইড, চারটি মনোস্যাকারাইড থাকলে টেট্রাস্যাকারাইড, পাঁচটি থাকলে পেন্টাস্যাকারাইড ইত্যাদি।

**ট্রাইস্যাকারাইড-** এদেরকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে তিন অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়। যেমন- র‍্যাফিনোজ **($C_{18}H_{32}O_{16}$)**। একে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ এবং এক অণু গ্যালাক্টোজ পাওয়া যায়।

**টেট্রাস্যাকারাইড-** এদেরকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চার অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়। যেমন- স্কার্ডোজ।

**(ঘ) পলিস্যাকারাইড :** পলিস্যাকারাইড হলো অনেকগুলো মনোমারের একত্রে পলিমারভুক্ত অবস্থা। আবার যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে দশের বেশি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদেরকে পলিস্যাকারাইড বলা হয়। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, ডেক্সট্রিন, ইনুলিন ইত্যাদি।

পলিস্যাকারাইডের বৈশিষ্ট্য- এরা উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ, এদের স্বাদ মিষ্ট নয় এবং এরা সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয়।

অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন নামক দুটি পলিস্যাকারাইড মিলিতভাবে গঠন করে স্টার্চ। উদ্ভিদে স্টার্চ সঞ্চিত বস্তু হিসেবে বিরাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সৃষ্ট চিনির অধিকাংশই স্টার্চে পরিবর্তিত হয়। ঘনীভূত দানা হিসেবে স্টার্চ উদ্ভিদ কোষে বিদ্যমান থাকে। স্টার্চে দানার আকার-আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকমের। বীজ, ফল, কন্দ, প্রভৃতি অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে। ধান, গম, আলু প্রভৃতি স্টার্চের প্রধান উৎস। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজই স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করে। স্টার্চ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। যেমন-

$(C_6H_{10}O_5)_n + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}} C_6H_{12}O_6$

স্টার্চ + পানি → গ্লুকোজ (অনেক অণু)

অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন উভয়েরই পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস করলে অসংখ্য $\alpha$-D গ্লুকোজ এককে পরিণত হয়। তাই স্টার্চ অসংখ্য গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত। অ্যামাইলোজে গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর কার্বনের ১-৪ স্থানে সংযুক্ত হয়। এক একটি অ্যামাইলোজে সাধারণত ২০০ থেকে ১০০০ গ্লুকোজ অণু থাকে। এর অণু শৃঙ্খল অশাখ। অ্যামাইলোপেকটিনে গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর কার্বনের ১-৪ স্থানে সংযুক্ত হয়। এছাড়াও $\alpha$-১-৬ অবস্থানেও সংযুক্ত থাকে। সাধারণত ২,০০০ থেকে ২,০০,০০০ গ্লুকোজ অণু এক একটি অ্যামাইলোপেকটিনে থাকে। এর অণু-শৃঙ্খল শাখান্বিত। আলু, ধান, গম, ভুট্টা, কলা ইত্যাদির স্টার্চে শতকরা ২২ ভাগ অ্যামাইলোজ এবং ৭৮ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন থাকে। অ্যামাইলোজ থাকায় স্টার্চের দ্রবণে আয়োডিন যোগ করলে কাল বর্ণ (কাল-নীল বর্ণ) ধারণ করে। কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়োডিন লাল বা পার্পল রং প্রদান করে। স্টার্চের আণবিক সংকেত হলো $(C_6H_{10}O_5)_n$।

**স্টার্চের বৈশিষ্ট্য-** স্টার্চ গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন এক প্রকার সাদা নরম অদানাদার পাউডার জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ, সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানি, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়, আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে, উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙ্গে ডেক্সট্রিনের বড় বড় কণায় পরিণত হয়, ফেহলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

স্টার্চের কাজ- উদ্ভিদ দেহে স্টার্চ প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবেই বিরাজ করে।

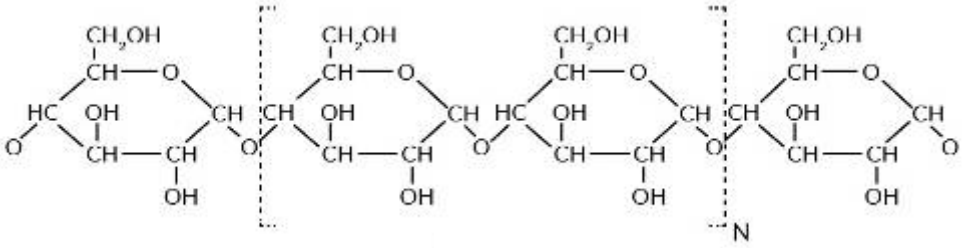

**চিত্র ৪.২.১৫ :** স্টার্চ

স্টার্চের ব্যবহার- স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়, স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীবদেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে।

**সেলুলোজ-** উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। অসংখ্য $\beta$-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর $\beta$-১-৪ কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ গঠন করে। উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোন কঙ্কাল নেই সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ। সেলুলোজের পরিমাণ তুলায় ৯৪%, লিনেনে ৯০% এবং কাঠে ৬০%। সেলুলোজকে ঘন $H_2SO_4$ বা HCl বা NaOH দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়। মানুষের পাকস্থলি বা অন্ত্রে সেলুলেজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ হজম হয় না অর্থাৎ পুষ্টিতে কোন কাজে আসে না। তবে সেলুলোজ গরু-ছাগলে পুষ্টি হিসেবেও কাজ করতে পারে। বস্ত্র ও বন শিল্পে প্রধান উপাদান সেলুলোজ, তাই মানব সভ্যতায় এর অবদান অপরিসীম।

**সেলুলোজের বৈশিষ্ট্য-** সেলুলোজ গন্ধহীন, স্বাদহীন, সাদা ও কঠিন জৈব রাসায়নিক পদার্থ, এটি পানিতে অদ্রবণীয়, এটি অবিজারক, এর আণবিক ওজন দু'লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ, এটি ফাইবার সদৃশ ও শক্ত এবং এর কোন পুষ্টিগুণ নেই।

সেলুলোজের কাজ- উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

সেলুলোজের ব্যবহার- সেলুলোজ কাগজ ও বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপাদান, একে অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহৃত হয়, একে নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আসবাবপত্র ও নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদানকারী প্রধান উপাদান সেলুলোজ, কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পুষ্টিনালিতে বসবাসকারী এক ধরনের পরজীবী সেলুলোজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্য করে।

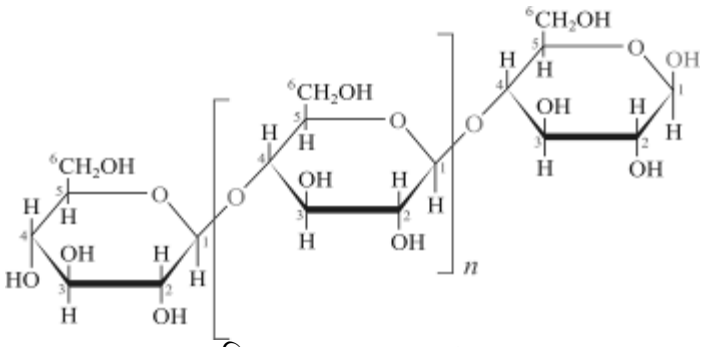

চিত্র ৪.২.১৬ : সেলুলোজ

**গ্লাইকোজেন-** গ্লাইকোজেন হলো একটি পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড। এটি প্রাণীদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য উপাদান হলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও কতিপয় ছত্রাকের (ঈস্ট) সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। গ্লাইকোজেন এর মূল গাঠনিক উপাদান $\alpha$-D গ্লুকোজ। অ্যামাইলোপেকটিনের ন্যায় এর অণু শৃঙ্খল ও শাখান্বিত। প্রতি শাখায় সাধারণত ১০ থেকে ২০টি গ্লুকোজ একক থাকে। হাইড্রোলাইসিস শেষে গ্লাইকোজেন হতে কেবল $\alpha$-D গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত- $(C_6H_{10}O_5)_n$।

**গ্লাইকোজেন এর কাজ-** প্রাণীদেহের লিভার ও পেশিতে বেশি করে গ্লাইকোজেন জমা থাকে যা প্রয়োজনে গ্লুকোজে পরিণত হয়। ফলে কার্বন ও শক্তি সরবরাহ হয়।

গ্লাইকোজেন এর বৈশিষ্ট্য- গ্লাইকোজেন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়, এটি সাদা পাউডার জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ, আয়োডিন দ্রবণে লালচে বেগুণী বর্ণ ধারণ করে এবং ঠান্ডা পানিতে এটি সাসপেনশন তৈরি করে।

গ্লাইকোজেন এর ব্যবহার- রক্তের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, যকৃতের গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয় এবং পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তি যোগায়।

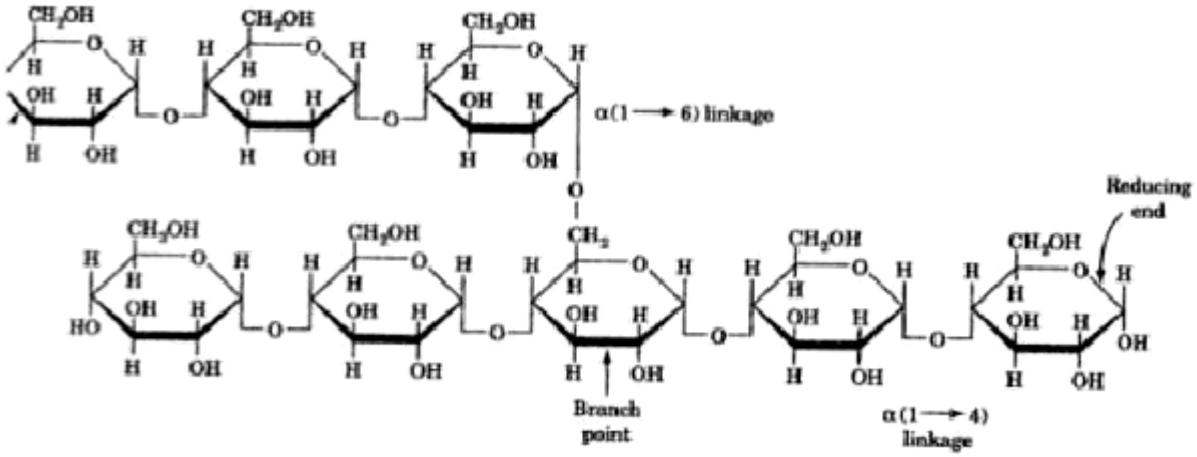


চিত্র ৪.২.১৭ : গ্লাইকোজেন

**প্রোটিন :** প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। আর অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক। প্রোটিন অণু বহু সংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে তৈরি। প্রোটিন শব্দটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন জি. মুলার ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রোটিন অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু। একটি কোষের অভ্যন্তরে সারাক্ষণ শত শত প্রকার প্রোটিন তৈরি হয়।

জীবদেহের প্রায় সর্বত্রই প্রোটিন বিরাজমান। জৈব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এনজাইম, অ্যান্টিবডি, হরমোন। এগুলো সবই প্রোটিন। সব এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়।

বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের আলফা- অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন্ড গঠন করে

তাকে পেপটাইড বন্ড বলে। প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়। দুটি ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইপেপটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে ট্রাইপেপটাইড, চার থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে অলিগোপেপটাইড। বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে। প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ। কোষের রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। বিশ প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডই প্রোটিনের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এছাড়া যুগ্ম প্রোটিনে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি বিরাজ করে।

**প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য-** প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত। বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায়। প্রোটিন পানিতে, লঘু অ্যাসিডে, ক্ষার ও মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। এতে সালফার, আয়রন ও তামা থাকে, অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত হয়। এতে প্রোটিনের আণবিক গঠনের পরিবর্তন হয় এবং প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

**প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ-** ভৌত, রাসায়নিক গুণাবলি এবং দ্রবণীয়তার উপর নির্ভর করে প্রোটিনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) সরল প্রোটিন, (খ) যুগ্ম প্রোটিন এবং (গ) উৎপাদিত প্রোটিন।

**(ক) সরল প্রোটিন :** যে সব প্রোটিনকে অ্যাসিড বা এনজাইম দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় সরল প্রোটিন। দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে এদেরকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। অ্যালবিউমিন, ২। গ্লোবিউলিন, ৩। গ্লুটেলিন, ৪। প্রোলামিন, ৫। হিস্টোন, ৬। প্রোটামিন এবং ৭। স্ক্লেরোপ্রোটিন।

**১। অ্যালবিউমিন-** যে সকল সরল প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রভীভূত হয় এবং ঘোলাটে দ্রবণ তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় অ্যালবিউমিন। এরা পানিতে এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ দিলে এরা জমাট বাঁধে। বার্লি ও বিটা-অ্যামাইলোজ একটি অ্যালবিউমিন। ডিমের সাদা অংশে, রক্তরসে ও দুধে অ্যালবিউমিন থাকে। অ্যালবিউমিন এর অপর নাম লিউকোসিন, ল্যাকটালবুমিন।

**২। গ্লোবিউলিন-** গ্লোবিউলিন পানিতে সাধারণত অদ্রবণীয়, তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। গ্লোবিউলিনও তাপে জমাট বাঁধে। বীজে এ ধরনের প্রোটিন বেশি পরিমাণে থাকে। এছাড়াও ডিমের কুসুম এবং রক্তরসে গ্লোবিউলিন থাকে।

**৩। গ্লুটেলিন-** গ্লুটেলিন পানিতে অদ্রবণীয়, তবে লঘু অ্যাসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয়। গ্লুটেলিন তাপে জমাট বাঁধে না। শস্য দানায় এ জাতীয় প্রোটিন বেশি থাকে। গমের গ্লুটেলিন এবং চালের অরাইজেনিন গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

**৪। প্রোলামিন-** যে সকল সরল প্রোটিন অ্যালকোহলে (৭০-৮০%) দ্রবীভূত হয় তাদেরকে বলা হয় প্রোলামিন। প্রোলামিন তাপে জমাট বাঁধে না। হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা বেশি পরিমাণে প্রোলিন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। ভুট্টার জেইন, গম ও রাইয়ের গ্লিয়াডিন এবং বার্লিন হর্ডিন ইত্যাদি প্রোলামিনের উদাহরণ।

**৫। হিস্টোন-** এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবনীয়। এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন- আরজিনিন, লাইসিন থাকে। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদেরকে নিউক্লিয়াসে এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায়। যেমন- নিউক্লিয়োহিস্টোন।

**৬। প্রোটামিন-** এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন। প্রোটামিনগুলো পানিতে এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্লাইড এ দ্রবণীয়। যেমন- ক্লুপিন, স্যামিন। এতে ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন- আরজিনিন বেশি থাকে। এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথেও দেখা যায়। প্রোটামিনে কোন সালফার থাকে না এবং টাইরোসিন, ট্রিপ্টোফ্যানও থাকে না। এরা তাপে জমাট বাঁধে না।

**৭। স্ক্লেরোপ্রোটিন-** এরা পানি এবং মৃদু লবণ দ্রবণে অদ্রবণীয়। প্রাণীদেহের হাড়, চুল, নখ, ত্বক, সংযোগ টিস্যুতে এ প্রোটিন বেশি থাকে। হাড়ে কোলাজিন, ইলাস্টিন এবং চুলে কেরাটিন থাকে।

**(খ) যুগ্ম প্রোটিন :** যে সকল প্রোটিনের সাথে কোন অপ্রোটিন অংশ যেমন প্রোসথেটিক গ্রুপ যুক্ত থাকে তাকে যুগ্ম প্রোটিন বলা হয়। এর অপর নাম কনজুগেটেড প্রোটিন। একে প্রোসথেটিক গ্রুপের প্রকৃতিভেদে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। নিউক্লিয়োপ্রোটিন, ২। লিপোপ্রোটিন, ৩। গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন, ৪। ক্রোমোপ্রোটিন, ৫। ফসফোপ্রোটিন এবং ৬। মেটালোপ্রোটিন।

**১। নিউক্লিয়োপ্রোটিন-** প্রোটামিন ও হিস্টোন জাতীয় ক্ষারীয় প্রোটিনের সাথে নিউক্লিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে তৈরি হয় নিউক্লিয়োপ্রোটিন। যেমন- নিউক্লিয়োপ্রোটামিন ও নিউক্লিয়োহিস্টোন। নিউক্লিয়োপ্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়। এক্ষেত্রে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রসথেটিক গ্রুপ। যেমন- নিউক্লিয়োপ্রোটামিন ও নিউক্লিয়োহিস্টোন।
**২। লিপোপ্রোটিন-** লিপোপ্রোটিনে সরল প্রোটিন ও বিভিন্ন প্রকার লিপিড তথা ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড প্রোসথেটিক গ্রুপ। বিভিন্ন ঝিল্লীর গাঠনিক উপাদান হিসেবে লিপোপ্রোটিন পাওয়া যায়। ডিমের কুসুম, দুধ ও কোষের বিভিন্ন ধরনের ঝিল্লীতে লিপোপ্রোটিন পাওয়া যায়।
**৩। গ্লাইকোপ্রোটিন-** গ্লাইকোপ্রোটিনে সরল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে। তার মানে সরল প্রোটিন ও শর্করা যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন হয়। যেমন- গ্লুকোস্যামাইন (Glucosamine), গ্যালাকটোস্যামাইন (Galactosamine)। কোষের ঝিল্লীর বা কোষ মেমব্রেনে বিশেষত মিউকাস মেমব্রেনে গ্লাইকোপ্রোটিন পাওয়া যায়, তাই একে মিউকোপ্রোটিন বলা হয়।
**৪। ক্রোমোপ্রোটিন-** ক্রোমোপ্রোটিনে সরল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত থাকে। যথা- ফাইকোবিলিন, ইহা নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও লাল শৈবালে থাকে। সরল প্রোটিন ও রাইবোফ্ল্যাভিন মিলে ফ্ল্যাভোপ্রোটিন তৈরি হয়। ক্রোমোপ্রোটিন উদ্ভিদের ফুল ও ফলের রং সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
**৫। ফসফোপ্রোটিন-** ফসফোপ্রোটিনে সরল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত থাকে। যেমন- দুধে উপস্থিত ক্যাসিনোজেন বা দুগ্ধ প্রোটিন, ডিমের কুসুমের ভাইটেলিন (Vitelline) ইত্যাদি।
**৬। মেটালোপ্রোটিন-** মেটালোপ্রোটিনের প্রোসথেটিক গ্রুপটি লৌহ, দস্তা, তামা, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর আয়ন। এরা প্রধানত এনজাইমের অ্যাকটিভেটর।
(গ) **উৎপাদিত প্রোটিন :** এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না। তাপের প্রভাবে এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয়। যেমন- পেপটাইড, প্রোটিয়েজ ইত্যাদি।

**লিপিড :** উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিড। লিপিড কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত কিন্তু এখানে তুলনামূলকভাবে কার্বোহাইড্রেট হতে কম পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। লিপিড সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত যৌগিক পদার্থ। এটি পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার, জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। লিপিড সাধারণত গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার। লিপিডের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা কম। সেজন্য লিপিড পানিতে ভাসমান থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড শক্ত থাকে কিন্তু ১০°-২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড তরল থাকে। উদ্ভিদ দেহে ফল ও বীজে অধিক পরিমাণে লিপিড সঞ্চিত দ্রব্য হিসেবে থাকে। সরিষা, সয়াবিন, তিল, চিনাবাদাম, রেড়ি বা ভেরেন্ডা, নারিকেল, পাম অয়েল বীজ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ দ্রবে উদ্ভিজ্জ ফ্যাট এবং মাছ, মাংস, মাখন, দুধ, ঘি, চর্বি, ডিম ইত্যাদি দ্রব্যে প্রাণীজ ফ্যাট পাওয়া যায়।
সাধারণভাবে গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত হয়। ফসফোলিপিড-এ গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন বেস থাকে। গ্লাইকোলিপিড-এ ফ্যাটি অ্যাসিড, স্যুগার ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। মোম জাতীয় লিপিডে গ্লিসারল এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে।
**লিপিডের বৈশিষ্ট্য :** লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, এটি বর্ণহীন, স্বাদহীন এবং গন্ধহীন পদার্থ। এরা ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফরম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়। এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে বিরাজ করে। লিপিড পানির চেয়ে হালকা, তাই এটি পানিতে ভাসে। হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।
**লিপিডের শ্রেণিবিভাগ-** গঠন প্রকৃতি অনুসারে লিপিড প্রধানত তিন প্রকার। যথা- (ক) সরল লিপিড, (খ) যৌগিক লিপিড এবং (গ) উৎপাদিত লিপিড।
নিম্নে কয়েক প্রকার লিপিড সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-
**(ক) সরল লিপিড-** যে সকল লিপিডের বিশ্লেষণে স্নেহ পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাদেরকে সরল লিপিড বলা হয়। সরল লিপিড দু'প্রকার। যথা- ১। স্নেহদ্রব্য ও ২। মোম।
**১। স্নেহদ্রব্য-** ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারল এস্টারই স্নেহদ্রব্য। এতে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে এক অণু গ্লিসারল যুক্ত হয়। একে ট্রাইগ্লিসারাইডও বলা হয়। ট্রাইগ্লিসারাইড দু'প্রকার। যথা- i. চর্বি ও ii. তেল।

i. **চর্বি-** যে সকল ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে সাধারণ তাপমাত্রায় (যেমন ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) কঠিন অবস্থায় বিরাজ করে তাদেরকে বলা হয় চর্বি। যেমন- উদ্ভিজ্জ চর্বি, নারিকেল তেল ও পামওয়েল। এর গলনাঙ্ক বেশি। কয়েকটি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড হলো লরিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৪৪° সে.), মাইরিস্টিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৫৪° সে.), পামিটিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৬৩° সে.), স্টিয়ারিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৭০° সে.), এবং লিনোলিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৮৪° সে.)।

ii. **তেল-** যে সকল ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে সাধারণ তাপমাত্রায় (যেমন- ২০° সেলসিয়াস) তরল অবস্থায় বিরাজ করে তাদেরকে বলা হয় তেল। যেমন- সাধারণ ভোজ্জ তেল। এর গলনাঙ্ক খুব কম। কয়েকটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড হলো অলিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ১৩° সে.), লিনোলিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৫° সে.), লিনোলেনিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ১০° সে.) এবং অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড (গলনাঙ্ক ৫০° সে.)।

**চর্বি ও তেলের কাজ-** ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগমকালে কার্বোহাইড্রেট এ পরিবর্তিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়।

**২। মোম-** ফ্যাটি অ্যাসিড যখন ট্রাই হাইড্রিক অ্যালকোহলের পরিবর্তে মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলবিশিষ্ট উপাদানের সাথে এস্টারীভূত হয় তখন তাকে মোম বলা হয়। কোন কোন উদ্ভিদে প্রাপ্ত মোম ২৪ থেকে ৩৬ কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট হয়। মৌচাক থেকেও প্রাকৃতিক মোম পাওয়া যায়।

মোমের বৈশিষ্ট্য- মোম পানিতে অদ্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় কারণ এদের হাইড্রোকার্বন চেইন এ কোন ডবল বন্ড থাকে না। সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন অবস্থায় বিরাজ করে।

মোমের কাজ- উদ্ভিদাঙ্গের উপরিতলে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। মোমবাতি তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রসাধন শিল্পেও মোম ব্যবহৃত হয় এবং উদ্ভিদের প্রস্বেদন হার কমায়।

**(খ) যৌগিক লিপিড-** যে সকল লিপিড সরল লিপিডের সাথে কিছু জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি তাদেরকে বলা হয় যৌগিক লিপিড। এটি স্নেহ এবং স্নেহহীন জাতীয় যৌগ। এরা তিন প্রকার। যথা- ১। ফসফোলিপিড, ২। গ্লাইকোলিপিড এবং ৩। সালফোলিপিড।

১। **ফসফোলিপিড-** গ্লিসারল, দু'অণু ফ্যাটি অ্যাসিড ও এক অণু ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে বলা হয় ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিড এক প্রকার যৌগিক লিপিড অর্থাৎ এ লিপিডে অস্নেহ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ফসফোটাইডিক অ্যাসিড একটি সরলতম ফসফোলিপিড কিন্তু ইহা উদ্ভিদে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। এটি অন্যান্য ফসফোলিপিড তৈরির মধ্যবর্তী বস্তু হিসেবে কাজ করে। লেসিথিন, কেফালিন, প্লাজমালোজেন ইত্যাদি ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিডের বিশেষ উপাদান হলো ফসফোটাইডিক অ্যাসিড। এর ফসফেট অংশটি কোলিন দ্বারা এস্টারীভূত হলে ফসফোলিপিডটি লেসিথিন নামে পরিচিত হয়। অনুরূপভাবে সেরিন হাইড্রোক্সিল দ্বারা এস্টারীভূত হলে কেফালিন উৎপন্ন করে। ফসফোটাইডিক অ্যাসিডের ফসফেট বর্গটি ইথানল অ্যামাইন দ্বারা এস্টারীভূত হলে তাকে কেফালিন বলা হয়। সেল এনভেলাপ, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, টনোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিয়ার এনভেলাপ ইত্যাদি পর্দা ফসফোলিপিড সংবলিত।

**ফসফোলিপিডের কাজ-** কোষ ঝিল্লী এবং বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর ঝিল্লীর গাঠনিক পদার্থ হিসেবে কাজ করে। আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। কয়েকটি এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড থাকে। ফসফোলিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

**২। গ্লাইকোলিপিড-** যে লিপিডসমূহে গ্লিসারলের আলফা ($\alpha$) অবস্থানের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা গ্লুকোজ বা গ্যালাকটোজ যুক্ত থাকে তাকে গ্লাইকোলিপিড বলা হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণকারী অঙ্গে ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনে গ্লাইকোলিপিড অধিক পরিমাণে থাকে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে সূর্যমুখী ও তুলার বীজ থেকে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

গ্লাইকোলিপিডের কাজ- সালোকসংশ্লেষণকারী অঙ্গাণু গঠনে গ্লাইকোলিপিডের ভূমিকা থাকে এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

৩। **সালফোলিপিড-** যে সকল গ্লাইকোলিপিডের সাথে সালফার যুক্ত থাকে তাদেরকে বলা হয় সালফোলিপিড। উদ্ভিদে সালফোলিপিড প্রচুর পরিমাণে থাকে। তবে ক্লোরোপ্লাস্টে এটি সীমিত আকারে থাকে।

**(গ) উৎপাদিত লিপিড-** যৌগিক লিপিডের আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উদ্ভুত হয় তাদেরকে উৎপাদিত লিপিড বলা হয়। এর অপর নাম উদ্ভুত লিপিড। যেমন- স্টেরয়েড, টারপিনস, রাবার ইত্যাদি।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে পাঁচটি করে শর্করা, প্রোটিন এবং লিপিড এর নাম লিখুন | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| শর্করা | | | | | |
| প্রোটিন | | | | | |
| লিপিড | | | | | |

**সারসংক্ষেপ**

পলিহাইড্রোক্সিয়্যালডিহাইড বা পলিহাইডোক্সিকিটোন এবং এ সব পদার্থ থেকে উদ্ভুত বস্তুকে বলা হয় কার্বোহাইড্রেট। দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। যথা- (ক) কার্বোহাইড্রেটের স্বাদ এবং (খ) কার্বোহাইড্রেটের আণবিক গঠন, আণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম। স্বাদের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- স্যুগার এবং নন স্যুগার। আণবিক গঠন, আণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। মনোস্যাকারাইড, ২। ডাইস্যাকারাইড, ৩। অলিগোস্যাকারাইড এবং ৪। পলিস্যাকারাইড। প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। আর অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক। ভৌত, রাসায়নিক গুণাবলি এবং দ্রবণীয়তার উপর নির্ভর করে প্রোটিনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) সরল প্রোটিন, (খ) যুগ্ম প্রোটিন এবং (গ) উৎপাদিত প্রোটিন। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিড। লিপিড কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত কিন্তু এখানে তুলনামূলকভাবে কার্বোহাইড্রেট হতে কম পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। লিপিড সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত যৌগিক পদার্থ। গঠন প্রকৃতি অনুসারে লিপিড প্রধানত তিন প্রকার। যথা- (ক) সরল লিপিড, (খ) যৌগিক লিপিড এবং (গ) উৎপাদিত লিপিড।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। স্বাদের উপর ভিত্তি করে শর্করা কত প্রকার ?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তেল তরল থাকে ?
(ক) ২০° (খ) ২১° (গ) ৩০° (ঘ) ১০°

৩। উৎপাদিত প্রোটিন হলো-
i. স্টেরয়েড ii. টারপিনস iii. রাবার
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৪। মোম-
i. এক ধরনের সরল লিপিড ii. রাসায়নিকভাবে সক্রিয়
iii. মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলবিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৫। ছয় কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড-
i. ফ্রুক্টোজ ii. ম্যানোজ iii. গ্লুকোজ
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

# পাঠ-৪.৩ জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন

| | | |
|---|---|---|
| | **প্রধান শব্দ** | DNA, RNA |

**জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা :** যে কোনো জীবদেহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো ডিএনএ (DNA)। জীবের কোষ বিভাজন থেকে আরম্ভ করে সকল ক্ষেত্রই এর নিয়ন্ত্রণে। ডিএনএ গঠনের একটি উপাদান হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ। ডিঅক্সিরাইবোজ এক প্রকার কার্বোহাইড্রেট। ডিএনএ থেকে বার্তা নিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় আরএনএ (RNA)। আরএনএ এর একটি গঠন উপাদান হলো রাইবোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় গ্লুকোজ যা একটি কার্বোহাইড্রেট। জীবদেহের অন্যান্য গাঠনিক বস্তু কাইটিন যা পতঙ্গ, কাঁকড়া, লোবস্টার এবং ছত্রাকের কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি সবই কার্বোহাইড্রেট। আমাদের দেহের শক্তি প্রদানকারী প্রধান খাদ্য উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট।

**কার্বোহাইড্রেটের কাজ**

১। জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। কারণ- এরা জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।
২। উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩। উদ্ভিদের দেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাঠামো প্রদান করে।
৪। হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫। উদ্ভিদদেহে সঞ্চয়ী পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে।
৬। ক্যালভিন চক্র ও ক্রেবস চক্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

**জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা :** জীবের জন্য প্রোটিন অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। ওয়াটসন ও ক্রিক কর্তৃক ডিএনএ অণুর মডেল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমরা জেনেছি কীভাবে জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে, কীভাবে তৈরি হচ্ছে জীবনের প্রধান ভিত্তি প্রোটিন। দেহের গঠন উপাদানের সব থেকে বড় অংশ প্রোটিন। এটি ছাড়া জীবের দেহাঙ্গ বা অঙ্গাণুর গঠন অসম্ভব। জীবিত দেহে কতকগুলো রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটিত হয় মাত্র। এসকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সব এনজাইমই প্রোটিন। বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ছাড়া জীবের অস্তিত্ব থাকে না, আর জিন এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে প্রোটিনের মাধ্যমে। অধিকাংশ হরমোনই প্রোটিন। বিভিন্ন হরমোন জীবদেহের নানা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন- ইনসুলিন, হিমোগ্লোবিন। দেহের ইমিউন সিস্টেমও প্রোটিনের উপর নির্ভর করে। প্রোটিনের সাহায্যে ট্রান্সক্রিপশনও সম্পন্ন হয় যা জীবের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ।

**প্রোটিনের কাজ**

১। কোষে প্রোটিন সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে এবং দরকারে শক্তি উৎপাদন করে।
২। কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং কোষ ঝিল্লী গঠনে সহায়তা করে।
৩। এনজাইম হিসেবে জীবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তথা জীবদেহকে সচল রাখে।
৪। অ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং দেহকে রোগ মুক্ত রাখে।
৫। জীবদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদন করে।
৬। নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে হিস্টোন প্রোটিন কার্যকর রাখে।

৭। কিছু প্রোটিন বিষাক্ত। এগুলো খেলে অনেক জীব মরে যায়। যেমন- সাপের বিষ এক প্রকার প্রোটিন।
৮। অনেক উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে। ফলে এরা অনেক পশু-পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।
৯। হিমোগ্লোবিন প্রোটিন প্রাণী দেহের সমস্ত কোষে অক্সিজেন সঞ্চালন করে।
১০। মানবদেহের পেপটাইড থেকে এক প্রকার প্রোটিন উৎপাদিত হয়। এটি ডিফেনসিভ অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করে।
১১। ইন্টারফেরন একটি কোষীয় প্রোটিন। দেহে ভাইরাস আক্রমণ করলে এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়। ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারফেরন ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত রোগে ব্যবহার করা যাবে।

**জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা :** লিপিড জীবদেহে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেল মেমব্রেন থেকে শুরুকরে অধিকাংশ কোষ অঙ্গাণুর আবরণী ফসফোলিপিড দিয়ে তৈরি। ফসফোলিপিড এদের গঠন উপাদান ছাড়াও দ্রব্যের আদান-প্রদানেও বিশেষ অবদান রাখে। লিপিডের অভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গাণুটি যদি কার্যকারিতা হারায় তবে বায়বীয় জীব বেঁচে থাকার শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হবে। লিপিড দিয়ে তৈরি ক্যারোটিনয়েডস, স্টেরয়েড হরমোন বা ভিটামিন এ, ডি, কে, ই প্রভৃতি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**লিপিডের কাজ**

১। চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেল বীজের (যেমন সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়। ফসফোলিপিড ও গ্লাইকোলিপিড সেল মেমব্রেন ও অন্যান্য কোষ অঙ্গাণুর মেমব্রেন গঠনকারী পদার্থ হিসেবে কাজ করে।
২। মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর অর্থাৎ কিউটিকল সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।
৩। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
৪। সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৫। প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে শর্করা, প্রোটিন এবং লিপিডের একটি করে কাজ উল্লেখ করুন | |
|---|---|---|
| শর্করা | প্রোটিন | লিপিড |
| | | |

**সারসংক্ষেপ**

যে কোনো জীবদেহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো ডিএনএ (DNA)। জীবের কোষ বিভাজন থেকে আরম্ভ করে সকল ক্ষেত্রই এর নিয়ন্ত্রণে। ডিএনএ গঠনের একটি উপাদান হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ। ডিঅক্সিরাইবোজ এক প্রকার কার্বোহাইড্রেট। ওয়াটসন ও ক্রিক কর্তৃক ডিএনএ অণুর মডেল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমরা জেনেছি কীভাবে জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে, কীভাবে তৈরি হচ্ছে জীবনের প্রধান ভিত্তি প্রোটিন। দেহের গঠন উপাদানের সব থেকে বড় অংশ প্রোটিন। এটি ছাড়া জীবের দেহাঙ্গ বা অঙ্গাণুর গঠন অসম্ভব। জীবিত দেহে কতকগুলো রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া সংঘটিত হয় মাত্র। এসকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া এনজাইম দ্বরা নিয়ন্ত্রিত হয়। সব এনজাইমই প্রোটিন। লিপিড জীবদেহে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেল মেমব্রেন থেকে শুরুকরে অধিকাংশ কোষ অঙ্গাণুর আবরণী ফসফোলিপিড দিয়ে তৈরি। ফসফোলিপিড এদের গঠন উপাদান ছাড়াও দ্রব্যের আদান-প্রদানেও বিশেষ অবদান রাখে। লিপিডের অভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গাণুটি যদি কার্যকারিতা হারায় তবে বায়বীয় জীব বেঁচে থাকার শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।**

১। নিচের কোনটির মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত?

(ক) ডিএনএ (খ) মাইটোকন্ড্রিয়া (গ) ক্লোরোপ- াস্ট (ঘ) ক্রোমোপ- াস্ট

২। উদ্ভিদে লিপিড -

i. আয়নের বাহক হিসেবে কাজ করে
ii. পাতার বহিরাবরণে স্তর সৃষ্টি করে
iii. সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৪.৪ এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- উৎসেচক বা এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **প্রধান শব্দ** | অ্যাকটিভ সাইট, **এনজাইম, সাবস্ট্রেট** |

**এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি :** কোন নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান (অ্যাকটিভ সাইট) থাকে। এমিল ফিশার (১৮৯৮) এনজাইমের সক্রিয় স্থান প্রস্তাব করেন। পলিপেপটাইড চেইনের ফলডিং এর মাধ্যমে সক্রিয় স্থান সৃষ্টি হয়। সক্রিয় স্থান ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো তালা-চাবির ন্যায় সুনির্দিষ্ট। যথা-

প্রথম পর্যায়ে, সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা সক্রিয় স্থানে সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙ্গে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়। যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছু অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। এ অতিরিক্ত শক্তিকে কার্যকরী শক্তি বলা হয়। এনজাইম-সাবস্ট্রেট এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তি সম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ তৈরি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বাড়ে।

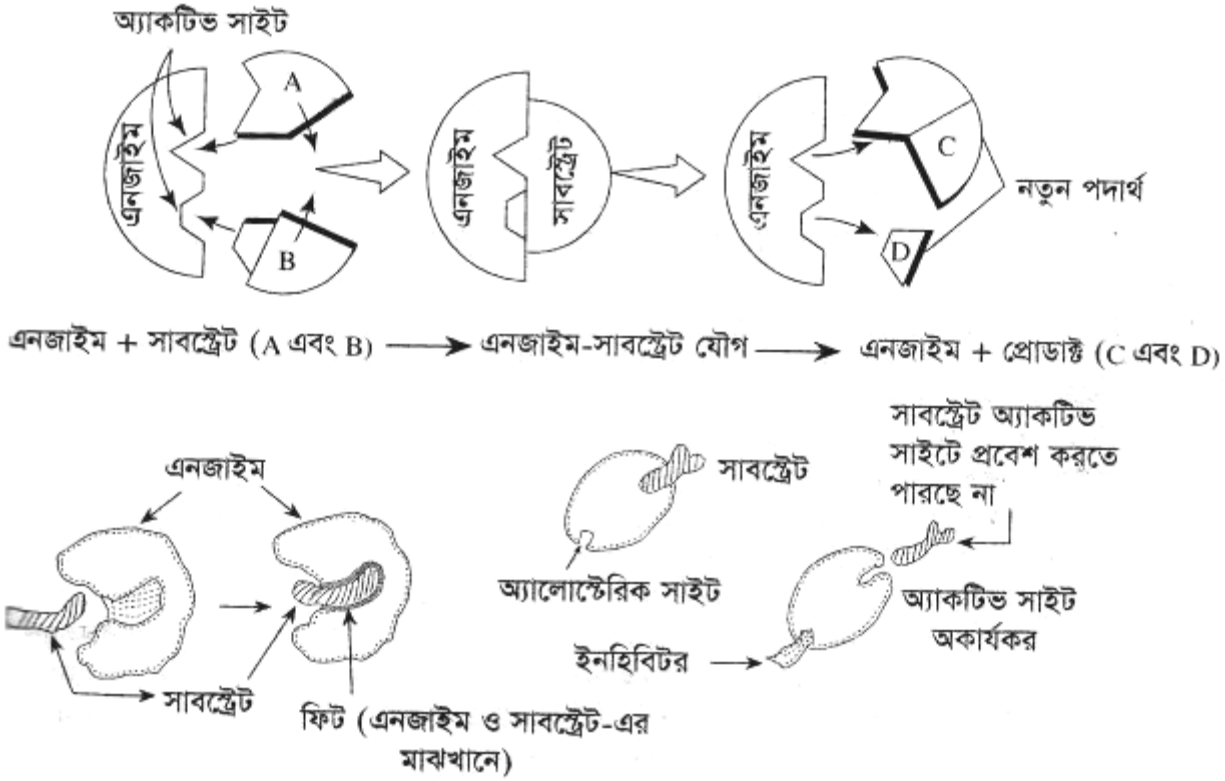


চিত্র ৪.৪ : এনজাইমের ক্রিয়া কৌশল

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি একটি সমীকরণের মাধ্যমে লিখুন |
|---|---|
| | |

**সারসংক্ষেপ**

এমিল ফিশার (১৮৯৮) এনজাইমের সক্রিয় স্থান প্রস্তাব করেন। পলিপেপটাইড চেইনের ফলডিং এর মাধ্যমে সক্রিয় স্থান সৃষ্টি হয়। সক্রিয় স্থান ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো তালা-চাবির ন্যায় সুনির্দিষ্ট। যথা- সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা সক্রিয় স্থানে সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে। এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙ্গে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়।

এনজাইম + সাবস্ট্রেট (A এবং B) ⟶ এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ⟶ এনজাইম + প্রোডাক্ট (C এবং D)।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।**

১। নিচের কোন ব্যক্তি এনজাইমের সক্রিয় স্থান প্রস্তাব করেন ?

(ক) এমিল ফিশার (খ) এমিল ডুর্খে (গ) এমিল পাশা (ঘ) এমিলো ফিশার

$A + B \xrightarrow{E} C + D$

২। উল্লিখিত বিক্রিয়ায় C ও D কে কী বলা হয় ?

(ক) প্রোডাক্ট (খ) এনজাইম (গ) অনুঘটক (ঘ) সাবস্ট্রেট

# পাঠ-৪.৫ এনজাইমের শ্রেণিবিভাগ

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **প্রধান শব্দ** | **হাইড্রোলেজ, অক্সিডোরিডাকটেজ, কার্বোক্সিলেজ, ট্রান্সফারেজ, ফসফোরাইলেজ, আইসোমারেজ, এপিমারেজ, লাইয়েজ, লাইগেজ** |

**এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস :** জৈবিক ক্রিয়ায় অসংখ্য এনজাইম কাজ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে আট শতাধিক এনজাইম শনাক্ত করা হয়েছে। এ অসংখ্য এনজাইমসমূহকে শনাক্ত করার জন্য এবং বোঝার সুবিধার্থে এদের শ্রেণিবিন্যাস করা দরকার। এদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে শ্রেণিবিস্যাস করা হয়। যথা- (ক) গঠন বৈশিষ্ট্য এবং (খ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি ।

**গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস :** গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এনজাইম দু'প্রকার। যথা-

**১। সরল এনজাইম-** শুধুমাত্র প্রোটিন দিয়ে গঠিত এনজাইমসমূহকে বলা হয় সরল এনজাইম। যেমন- সুক্রেজ।

**২। যৌগিক এনজাইম-** যে এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় যৌগিক প্রোটিন। যেমন- FAD।

**রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস :** রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমগুলোকে প্রধানত নয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। হাইড্রোলেজ, ২। অক্সিডোরিডাকটেজ, ৩। কার্বোক্সিলেজ, ৪। ট্রান্সফারেজ, ৫। ফসফোরাইলেজ, ৬। আইসোমারেজ, ৭। এপিমারেজ, ৮। লাইয়েজ এবং ৯। লাইগেজ।

**১। হাইড্রোলেজ এনজাইম-** এ শ্রেণির এনজাইম কোন পদার্থের সাথে পানি সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে।

$$\text{সুক্রোজ} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{সুক্রেজ}} \text{গ্লুকোজ} + \text{ফ্রুকটোজ}$$

উদাহরণ- সুক্রেজ, লাইপেজ, এস্টারেজ, ফসফেটেজ, পেপসিন ইত্যাদি।

**২। অক্সিডোরিডাকটেজ এনজাইম-** এ ধরনের এনজাইম কোন পদার্থের সাথে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা ইলেকট্রন সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে।

$$\text{৩-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড} + \text{ফসফেট} \underset{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}}{\overset{\text{ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড}}{\rightleftharpoons}} \text{১,৩- বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড}$$

**উদাহরণ** - অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ ইত্যাদি।

**৩। কার্বোক্সিলেজ-** এ শ্রেণির উৎসেচক কোন পদার্থের সাথে $CO_2$ অণু সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে।

$$\text{অক্সালোসাকসিনিক অ্যাসিড} \underset{\text{কার্বোক্সিলেজ}}{\rightleftharpoons} \text{আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড} + CO_2$$

**৪। ট্রান্সফারেজ-** এ শ্রেণির এনজাইম কোন একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে (যথা- $NH_2$ গ্রুপ) অপসারিত করে অন্য একটির সাথে যুক্ত করে।

$$\text{গ্লুটামিক অ্যাসিড} + \text{অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড} \xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}} \text{আলফা-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড} + \text{অ্যাসপারটিক অ্যাসিড}$$

**৫। ফসফোরাইলেজ এনজাইম-** এক জাতীয় ট্রান্সফারেজ এনজাইম। এ শ্রেণীর এনজাইম কোন পদার্থতে ফসফেট গ্রুপ সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে। এ শ্রেণির কিছু উৎসেচক শুধুমাত্র সংযুক্ত করতে পারে এবং অন্যগুলো শুধু বিযুক্ত করতে পারে, সেহেতু রাসায়নিক বিক্রিয়া একমুখী, উভয়মুখী নয়।

$$\text{গ্লুকোজ} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{ফসফোরাইলেজ}} \text{গ্লুকোজ- ৬- ফসফেট} + \text{ADP}$$

**৬। আইসোমারেজ এনজাইম-** এ শ্রেণির এনজাইম অ্যালডোজ ও কিটোজ স্যুগার এর আইসোমেরিক পরিবর্তন সাধন করে।

গ্লুকোজ - ৬- ফসফেট $\underset{\text{ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ}}{\rightleftharpoons}$ ফ্রুক্টোজ - ৬ - ফসফেট

**৭। এপিমারেজ এনজাইম-** এ শ্রেণির এনজাইম সমূহ কোন পদার্থকে তার এপিমারে পরিবর্তিত করে। এপিমারগুলো কেবলমাত্র একটি কার্বন পরমাণুর অবস্থানে ভিন্নতা দেখায়।

জাইলুলোজ-৫- ফসফেট $\xrightarrow{\text{এপিমারেজ}}$ রাইবুলোজ ৫-ফসফেট

**৮। লাইয়েজ এনজাইম-** এ প্রকার এনজাইম কার্যকারিতায় সাবস্ট্রেট অণু আর্দ্র বিশ্লেষিত না হয়েই দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যথা- অ্যালডোলেজ।

ফ্রুক্টোজ ১,৬ বিসফসফেট $\underset{\text{অ্যালডোলেজ}}{\rightleftharpoons}$ ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড + ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

**৯। লাইগেজ এনজাইম-** এ জাতীয় এনজাইম ATP এর সহায়তায় একের অধিক সাবট্রেটকে সংযুক্ত করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে।

গ্লুটামিক অ্যাসিড + $NH_3$ + ATP $\underset{\text{সিনথেটেজ}}{\overset{\text{গ্লুটামিক}}{\rightleftharpoons}}$ গ্লুটামিন + ADP + iP

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে এনজাইম সম্পর্কিত যে কোনো তিনটি বিক্রিয়া লিখুন | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**সারসংক্ষেপ**

এনজাইমকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে শ্রেণিবিস্যাস করা হয়। যথা- (ক) গঠন বৈশিষ্ট্য এবং (খ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি। গঠন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এনজাইম দু'প্রকার। যথা- ১। সরল এনজাইম এবং ২। যৌগিক এনজাইম। রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমগুলোকে প্রধানত নয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। হাইড্রোলেজ, ২। অক্সিডোরিডাকটেজ, ৩। কার্বোক্সিলেজ, ৪। ট্রান্সফারেজ, ৫। ফসফোরাইলেজ, ৬। আইসোমারেজ, ৭। এপিমারেজ, ৮। লাইয়েজ এবং ৯। লাইগেজ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।**

১। সুক্রেজ একটি-

(ক) সরল এনজাইম (খ) বক্র এনজাইম (গ) যৌগিক এনজাইম (ঘ) যুগ্ম এনজাইম

২। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমগুলো হলো-

i. হাইড্রোলেজ ii. ফসফোরাইলেজ iii. এপিমারেজ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ঘ) i, ii, iii

# পাঠ-৪.৬ বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **প্রধান শব্দ** | সেলুলেজ, প্রোটিয়েজ, অ্যামাইলেজ, জাইমেজ, ক্যাটালেজ |

**বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার :** এনজাইম জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে। ফলে জীবদেহ কর্মক্ষম থাকে। এনজাইমের কার্যক্রম দ্বারা জীবদেহের গঠন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবদেহে শক্তি সঞ্চয় এবং শক্তি নির্গমন উভয়ের পেছনে এনজাইম ক্রিয়া করে। এটি বিক্রিয়ার হার বাড়ায় কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে। এটি বিভিন্ন জটিল যৌগকে সরল যৌগে পরিণত করে। আবার এনজাইম দেহের বিভিন্ন দরকারি রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষণ করে। স্বল্প পরিমাণ এনজাইম প্রচুর পরিমাণ সাবস্ট্রেটকে উৎপাদে পরিণত করে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে গেলে বিক্রিয়ার গতি অনেক সময় কমে। সত্যিকার অর্থে এর ক্রিয়া অণুঘটকের ন্যায়। বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে কয়েকটি এনজাইমের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

**সেলুলেজ এনজাইম :** যে এনজাইম সেলুলোজ নামক পলিস্যাকারাইডকে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে সেলোবায়োজ নামক ডাই স্যাকারাইডে পরিণত করে তাকে সেলুলেজ এনজাইম বলা হয়। সেলুলেজ একটি হাইড্রোলেজ জাতীয় এনজাইম। পরবর্তীতে সেলোবায়োজ সম্পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস হয়ে $\beta$- গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

**সেলুলেজ এনজাইমের কাজ-** উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক পদার্থ সেলুলোজ। সেলুলোজ মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। কিছু অণুজীব ও ছত্রাক সেলুলেজ উৎপন্ন করতে পারে এবং সেলুলোজ ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে যেতে সাহায্য করে।

$$\text{সেলুলোজ} \xrightarrow{\text{সেলুলেজ}} \text{সেলোবায়োজ} \xrightarrow{\text{সেলোবায়েজ}} \beta\text{- গ্লুকোজ}$$

**প্রোটিয়েজ এনজাইম :** যে সকল এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে তাকে বলা হয় প্রোটিয়েজ এনজাইম। চারটি বিভিন্ন এনজাইমকে একত্রে প্রোটিয়েজ বলা হয় সুতরাং প্রোটিয়েজ এক প্রকার যৌগিক এনজাইম। চারটি এনজাইমের নাম পেপসিন, ট্রিপসিন, ইরেপসিন ও প্যাপেইন। পেপসিন- প্রোটিনকে হাইড্রোলাইসিস করে প্রোটিওজ ও পেপটোনে পরিণত করে। ট্রিপসিন- প্রোটিনকে হাইড্রোলাইসিস করে প্রোটিওজ, পেপটোন, পলিপেপটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। ইরেপসিন- পেপটাইডসমূহকে হাইড্রোলাইসিস করে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। প্যাপেইন - প্রোটিনকে প্রোটিওজ, পেপটোন, পেপটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। উদ্ভিদের যথা- বিভিন্ন প্রকার ডালের বীজে সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় হাইড্রোলাইসিস হয়ে ভেঙে যায় এবং তা ভ্রূণে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। প্রাণীরা যে আমিষ জাতীয় খাদ্য খায় তা প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ভেঙে যায় (হজম হয়) ও পরবর্তীতে দেহ গঠনে সহায়তা করে।

**অ্যামাইলেজ এনজাইম :** স্টার্চ বা শ্বেতসার নামক পলিস্যাকারাইডকে হাইড্রোলাইসিসকারি এনজাইমের নাম অ্যামাইলেজ। অ্যামাইলেজ দু'প্রকার। যথা- আলফা অ্যামাইলেজ এবং বিটা অ্যামাইলেজ। স্টার্চ এর সামগ্রিক ওজনের প্রায় ২০% অ্যামাইলোজ ও বাকী প্রায় ৮০% অ্যামাইলো পেকটিন। আলফা অ্যামাইলেজ অ্যামাইলোজকে ভেঙে ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে এবং বিটা- অ্যামাইলেজ ডেক্সট্রিনকে মল্টোজ নামক ডাইস্যাকারাইডে রূপান্তরিত করে। আলফা- অ্যামাইলেজ এবং বিটা- অ্যামাইলেজ এর বিক্রিয়ার ফলে অ্যামাইলোপেকটিন ভেঙে মল্টোজ এ পরিণত হয়।

**জাইমেজ এনজাইম :** কতকগুলো ছত্রাক, বিশেষ করে, ঈস্ট নামক ছত্রাকের কোষে জাইমেজ নামক জটিল এনজাইম বিদ্যমান। এ এনজাইম সমষ্টি ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার চিনি ও গ্লুকোজকে ঈস্টের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় ভেঙে ইথাইল অ্যালকোহল এ পরিণত করে। অ্যালকোহল তৈরিতে ও বেকারী শিল্পে জাইমেজকে ব্যবহার করা হয়।
**ক্যাটালেজ এনজাইম :** ক্যাটালেজ এনজাইম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে ভেঙে পানি ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O+O_2$$

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকটি পূরণ করুন | | | |
|---|---|---|---|---|
| সেলুলেজ এর কাজ | প্রোটিয়েজ এর কাজ | অ্যামাইলেজ এর কাজ | জাইমেজ এর কাজ | ক্যাটালেজ এর কাজ |
| | | | | |

**সারসংক্ষেপ**

যে এনজাইম সেলুলোজ নামক পলিস্যাকারাইডকে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে সেলোবায়োজ নামক ডাই স্যাকারাইডে পরিণত করে তাকে সেলুলেজ এনজাইম বলা হয়। যে সকল এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে প্রোটিনের একক অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে তাকে বলা হয় প্রোটিয়েজ এনজাইম। চারটি বিভিন্ন এনজাইমকে একত্রে প্রোটিয়েজ বলা হয় সুতরাং প্রোটিয়েজ এক প্রকার যৌগিক এনজাইম। চারটি এনজাইমের নাম পেপসিন, ট্রিপসিন, ইরেপসিন ও প্যাপেইন। স্টার্চ বা শ্বেতসার নামক পলিস্যাকারাইডকে হাইড্রোলাইসিসকারি এনজাইমের নাম অ্যামাইলেজ। অ্যামাইলেজ দু'প্রকার। যথা- আলফা অ্যামাইলেজ এবং বিটা অ্যামাইলেজ। কতকগুলো ছত্রাক, বিশেষ করে, ঈস্ট নামক ছত্রাকের কোষে জাইমেজ নামক জটিল এনজাইম বিদ্যমান। ক্যাটালেজ এনজাইম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে ভেঙে পানি ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।**

১। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে ভেঙে পানি ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে কোন এনজাইম ?
(ক) ক্যাটালেজ (খ) জাইমেজ (গ) পেপটিডেজ (ঘ) কাটালেজ

২। প্রোটিয়েজ এনজাইম নিচের কোনটি ?
(ক) প্যাপেইন (খ) ক্যাটালেজ (গ) প্যাপেন (ঘ) জাইমেজ

৩। প্যাপেইন-
i. প্রোটিনকে প্রোটিওজ এ রূপান্তরিত করে
ii. প্রোটিনকে পেপটোন এ রূপান্তরিত করে
iii. প্রোটিনকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, iii

## চূড়ান্তমূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

| | |
|---|---|
| নমুনা লিপিড-১ | ক্লোরোপ্লাস্ট, টনোপ্লাস্ট এবং সেল মেমব্রেন তৈরির উপাদান |
| নমুনা লিপিড-২ | রাবার এক ধরনের লিপিড |
| নমুনা লিপিড-৩ | মোমবাতি জন্ম দিনে এবং শিল্পে ব্যবহৃত হয় |

(ক) তেল কী ?

(খ) তেল ও চর্বির প্রধান পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(গ) নমুনা লিপিড তিনটি কীভাবে তৈরি হয় তা বর্ণনা করুন।

(ঘ) প্রত্যেকটি নমুনা লিপিডের দুটি করে কাজ লিখুন।

## উত্তরমালা

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। গ ২। ক**
**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ক ২।ক ৩। ঘ ৪। গ ৫।ঘ**
**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। ক ২। ঘ**
**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। ক ২। ক**
**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। ক ২। ঘ**
**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ : ১। ক ২। ক ৩। ঘ**